

কাজী নজরুল যেভাবে বাংলাদেশের হলেন

ইয়াকুব আলী

১.

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এক বড় কীর্তি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে আনা। নজরুল দেশকে ভালোবেসেছিলেন বুক উজাড় করে। ভুল বললাম। দেশের সাথে তার অস্তিত্ব মিশে গিয়েছিল। দেশ মানে গোটা ভারতবর্ষ। তাঁর জন্ম বিহারের পাদদেশে বর্ধমানের রক্ষ, শুষ্ক, বেরী প্রাকৃতিক পরিবেশে। কিন্তু বাংলাদেশ তার বিপরীত- সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা। নানা উপলক্ষে তিনি এসেছেন বাংলাদেশে। কখনো শুধুই বেড়ানোর জন্য, আবার কখনো কর্ম উপলক্ষে, কখনো সভা-সমিতিতে যোগ দিতে। এমনকি ১৯২৬ সালের সংসদ (ভারতীয় ব্যাপস্থাপক সভা) নির্বাচনে লড়তেও এসেছেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই পূর্ববঙ্গে- ঢাকা-ফরিদপুরে। তিনি বাংলাদেশকে বড়ো আপন মনে করেছেন। বাংলাদেশও তাঁকে টেনে নিয়েছে আপন মমতায় যেমন কুমিল্লার বিরজাসুন্দরী দেবী স্নেহকাঙাল নজরুলকে বরণ করেছিলেন পুত্রস্নেহে।

বঙ্গবন্ধুর কল্যাণে এই বাংলাদেশই শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল কবির চিরদিনের ঠিকানা। ঝঞ্জার মতো উদ্দাম নজরুল ভ্রমণ করেছেন বাংলাদেশের নানা জায়গায়- ময়মনসিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা, ঢাকা, বগুড়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালীর সন্দ্বীপ (তখন সন্দ্বীপ নোয়াখালীর অধীন ছিল), ফেনী, সিলেট, রাজশাহী, দিনাজপুর, খুলনা, রংপুর, চুয়াডাঙ্গা, সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, যশোর, ফরিদপুর, জয়দেবপুর, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রামে এমনকি জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে পর্যন্ত। কুমিল্লার আলী আকবর খানের চক্রে পড়ে তো তিনি কুমিল্লার জামাই-ই হয়ে গেলেন। ডেইলি স্টারে প্রকাশিত এক নিবন্ধ থেকে জানা যায় নজরুল বাংলাদেশের ২৬টি জেলা সফর করেছেন। কোনো কোনোটিতে এসেছেন ৬/৭ বার করেও।

ঢাকা থেকে কলকাতা এখন যত দূরের মনে হয় কবির বয়সকালে কিন্তু সেরকম ছিল না। অর্থাৎ এখনকার মত মানসিক দূরত্বটি ছিল না। এসময়ে ‘অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা’ মনে হলোও তখনকার দিনে কলকাতার সঙ্গে বাংলা ভূখণ্ডের মানুষের একটা স্মার্ট যোগাযোগই ছিল বলে মনে হয়। নদীপথে গোয়ালন্দঘাটঘাট। এরপর ট্রেনে কলকাতা। কুমিল্লা থেকে নজরুল দুই দিনে কলকাতা পৌঁছতেন। নিত্য চলত কলকাতামুখী হাজার হাজার মানুষের মিছিল।

সাহিত্যিক আবুল ফজল তার স্মৃতিকথা ‘রেখাচিত্র’ গ্রন্থে লিখছেন : ‘১৯২২ সালে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানেই বের হলো নজরুলের ব্যথার দান ও অগ্নি-বীণা (বই দুটি)। তখন আমি দশম শ্রেণির ছাত্র। থাকি জায়গীরে- কোনো রকম আর্থিক সঙ্গতি নেই। তবু অর্ডার দিয়ে কলকাতা থেকে পার্সেলেই বই দুটো আনালাম। তিন মাসের চাঁদা অগ্রিম পাঠিয়ে আমি হয়ে গেলাম ‘ধুমকেতু’র গ্রাহক।’ পাঠক, লক্ষ্য করুন, চট্টগ্রামের মাদ্রাসার ক্লাস টেনের দরিদ্র এক বালক কলকাতা থেকে অর্ডার দিয়ে পার্সেলে বই আনায়! যেন আজকের ডিজিটাল দিনে রকমারিতে অর্ডার দিয়ে বই পাওয়ার মতো ব্যাপার। ঢাকায় বসে ঢাকার বইয়ের অনলাইন পরিবেশকের বই পেতেও সপ্তাহ পার হয়ে যায় হর-হামেশাই। আবুল ফজলের তারুণ্যের যুগে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রামের বাস বা ট্রেন যোগাযোগ ছিল না। একবার আবুল ফজল দুই বন্ধুর সাথে ঢাকা থেকে হেঁটেই চট্টগ্রাম চলে গিয়েছিলেন। চাটগাঁয়ের মানুষ ট্রেনে চেপে আসত চাঁদপুরে। সেখান থেকে ইস্টিমারে নারায়ণগঞ্জ হয়ে সেখান থেকে আরেক ট্রেনে চেপে ঢাকার ফুলবাড়িয়ায়। আর কলকাতাগামীরা চাঁদপুর থেকে যেতেন গোয়ালন্দে। সেখান থেকে ট্রেনে শিয়ালদা। কাজেই চট্টগ্রামের মানুষের কাছে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা আর কলকাতা যাত্রার মধ্যে খুব বেশি কি ফারাক ছিল? মনে হয় না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি নজরুল উভয়ই প্রিয় ছিলেন। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের বন্দিশালা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন দেশে ফিরে জনগণের জাগরণ লক্ষ্য করে বঙ্গবন্ধু তার ভাষণেও বলেছেন : ‘কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সাত কোটি বাঙ্গালিরে, হে বঙ্গজননী, রেখেছ বাঙ্গালি করে, মানুষ করোনি। কবিগুরুর মিথ্যা কথা প্রমাণ হয়ে গেছে। আমার বাঙ্গালি আজ মানুষ।’ স্বাধীনতার পর কবিগুরুর গানকে জাতীয় সংগীত আর নজরুলের গানকে বাংলাদেশের রণসংগীত হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে নবগঠিত একটি ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের মধ্যে একটি ভারসাম্য স্থাপন করা হয়। প্রায় তিন দশক আগে ‘সৃষ্টিসুখের উল্লাস’ থেমে যাওয়া একজন কবির জন্য এটি ছিল একটি বিরাট স্বীকৃতি।

২.

উপমহাদেশে স্বাধীনতার প্রথম দাবি উত্থাপনকারী কবি পশ্চিমবঙ্গে দুর্দিনে আছেন, চরম অবহেলার শিকার হচ্ছেন ভেবে বঙ্গবন্ধু কবিকে ঢাকায় এনে সাড়ম্বরে তাঁর জন্মদিন উদযাপনের চিন্তাভাবনা করেন। উদযাপন তো হতেই হবে। তিনি মাত্র ৯ মাসের যুদ্ধের মাধ্যমে ছিড়েছেন বাঙালির ২৩

বহুরের গোলামীর জিজ্ঞাসা! উদযাপনের উপলক্ষ্যই বটে। সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে কবিকে সপরিবারে বাংলাদেশে আনার ব্যবস্থা করা হয়। ৪৭ এর দেশবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বাংলায় প্রভাবশালী ও বুদ্ধিজীবী মহলে নজরুলকে নিয়ে অনেক রাজনীতি হয়েছে। ভারতের হিন্দুদের কাছে তিনি ‘নেড়ে’ ‘মুসলমান কবি’ কাজেই পরিত্যাজ্য। শরিফ মুসলমানদের কাছে আগে থেকেই ‘কাফের’ ‘বেইমান’। দেশবিভাগের পরপর সাচ্চা পাকিস্তানপন্থি কবি-সাহিত্যিকদের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন নজরুল ‘পাকিস্তানের আদর্শের অনুসারী নন’- তিনি পাকিস্তান বা কায়েদে আয়মকে নিয়ে কোনো কবিতা লেখেননি। উপরন্তু ‘পাকিস্তান’কে নাকি বলেছিলেন ‘ফাঁকিস্তান’। কাজেই তিনি পাকিস্তানের কবি হন কীভাবে? হিন্দুয়ানি অংশ বাদ দিয়ে নজরুল রচনাবলির পাকিস্তান সংস্করণ প্রকাশেরও প্রস্তাব করে বসেন প্রতিষ্ঠিত এক কবি। নজরুলকে কেটে ছেটে গ্রহণ করার আগ্রহ দেখান কেউ কেউ। কিন্তু পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলন, ৫৪ এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ষাটের দশকের সাংস্কৃতিক আন্দোলন পূর্ববঙ্গে নজরুলকে প্রাসঙ্গিক রেখেছিল জোরালোভাবেই। এ বঙ্গে মানুষের মন থেকে নজরুল কখনো বিস্মৃত হননি।

১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের এক মাসের মধ্যে রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬-৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম বিদেশ সফরে যান কলকাতায়। সে সফরে তার যা কিছু অর্জন তার মধ্যে অন্যতম হলো কবিকে বাংলাদেশে আনার পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধুর এই পদক্ষেপটি এখনো সেভাবে আলোচিত/মূল্যায়িত হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে একথা বলা যায় যে, এর মাধ্যমে প্রায় বিস্মৃত কবিকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা হলো। তিন দশক আগে শেষ হয়ে যাওয়া কবিকে বাঁচিয়ে তোলা হলো। কলকাতা সফরকালে বঙ্গবন্ধুকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে রাখা হয় পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনে। রাজভবন হলো রাজ্যপালের (গভর্নর) অফিসিয়াল বাসভবন। রাজ্যপাল তখন পশ্চিমের অ্যান্টনি ল্যান্সলট ডায়াস। বঙ্গবন্ধু তাঁর কাছেই কবিকে বাংলাদেশে আনার প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। তিনি কবিকে ঢাকায় এনে ধুমধাম করে কবির ৭৩তম জন্মদিনটি পালন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। রাজ্যপালের পরামর্শে বিষয়টি নিয়ে বঙ্গবন্ধু ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেন। এরই মধ্যে খবর পাঠিয়ে রাজভবনে কবির পরিবারের সদস্যদের আনিয়ে আলাপ করেন বঙ্গবন্ধু। কবির দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধকে জানিয়ে রাখেন যে, বাংলাদেশ সসম্মানে নজরুলকে নিয়ে গিয়ে সংবর্ধনা দিতে চায়।

এরপর চলে চিঠি-চালাচালিসহ নানামুখী কূটনৈতিক তৎপরতা। কবির পুত্ররা ঢাকায় এসে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে যান। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের মতামত জানতে চেয়েছিলেন বলে জানা গেছে। ভারতের স্বাধীনতার প্রথম স্পষ্ট দাবি উত্থাপনকারী নজরুল ততদিনে ভারতে অনেকটাই উপেক্ষিত। তিনি বাকশক্তিহীন ও বোধ-বুদ্ধিহীন। অসুস্থ কবির স্ত্রী গত হয়েছিলেন তারও ১০ বছর আগে ১৯৬২ সালে। কাছের মানুষজনও ধীরে ধীরে সরে পড়েছিলেন। কবিকে নিয়ে আমজনতার উচ্ছ্বাস ফুরিয়ে গিয়েছিল বহু আগেই। মুসলমানরা তো ‘কাফের’ হিসেবে আগেই মাইনাস করে রেখেছিল। সবার নজরুল ততদিনে আর কারোরই না। কমিউনিস্টরা একসময় কবিকে নিজেদের সম্পদ মনে করলেও একেজো নজরুলকে তারা ভুলেই গিয়েছিল। কলকাতারও তখন ট্রাহি ট্রাহি অবস্থা। খাদ্য আন্দোলনে কলকাতা ক্লান্ত, শ্রান্ত। এদিকে মাওবাদের জোয়ার শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। নকশালবাড়ি আন্দোলন মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে সর্বত্র। ফলে কাজী নজরুল ইসলাম নামের ‘না- হিন্দু-না-মুসলমান’ মুক এক কবি সেখানে থাকবেন না সেখান থেকে অন্য কোথাও যাবেন তা নিয়ে কলকাতার ভাববার অবকাশ কোথায়? বিবিসি বাংলার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এরূপ মন্তব্যই করেছেন পশ্চিমবঙ্গের নজরুল গবেষক অর্ক দেব। সৌগত রায় নামের একজন প্রবীণ রাজনীতিকের মতে, নজরুলকে নিয়ে উন্মাদনা ও আবেগগুলো থিতুয়ে আসায় তাঁর ঢাকা যাওয়া নিয়ে কোনো হই-চই হয়েছিল বলে তাঁর মনে পড়ে না।

যাহোক, নজরুলকে আনার জন্য বঙ্গবন্ধু কলকাতায় পাঠান তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি তৎকালীন ক্যাবিনেট মন্ত্রী মতিউর রহমান এবং আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুস্তাফা সারোয়ারকে। ‘হে কবি’ সম্বোধন করে নজরুলকে চিঠি লিখে দেন বঙ্গবন্ধু। চিঠিতে কবিকে সপরিবারে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রতিনিধিদ্বয়ের মারফতে কলকাতায় প্রতিবাদের কথা জানা যায়। তারা লক্ষ করেন দমদম থেকে কলকাতাগামী রাস্তার দুপাশের দেয়ালে পোস্টার লাগানো হয়েছে যাতে বলা হয়েছে: ‘অসুস্থ কবি নজরুলকে বাংলাদেশে নেওয়া যাবে না’। দুই চার জন হয়তো প্রতিনিধিদলকে দেখানোর জন্য বিক্ষোভও করে থাকবেন। তবে অভ্যন্তরীণ নানা সমস্যায় জর্জরিত কলকাতা নগরীতে এসব দায়সারা আন্দোলনের তেমন প্রভাব পড়েছিল বলেও মনে হয় না। তবে হ্যাঁ, কবির ছোট ছেলে অনিরুদ্ধ কবিকে ঢাকায় আনার বিরুদ্ধে ছিলেন। যদিও বড় ছেলে সব্যসাচীর এ ব্যাপারে উৎসাহ ছিল খুবই। অবশেষে ১৯৭২ সালের চব্বিশে মে সকাল ১১ টা ৪০ মিনিটে বাংলাদেশ বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইটে চড়ে কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছেন কবি। কবির সঙ্গে আসেন দুই ছেলে, তাদের স্ত্রী ও সন্তানরা এবং কবির ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডি কে রায়। কবিকে অভ্যর্থনা জানাতে ঢাকার এয়ারপোর্ট অর্থাৎ তেজগাঁও বিমানবন্দর ততক্ষণে লোকে-লোকারণ্য। এত মানুষ সেখানে ভিড় জমিয়েছিল যে বিমানের সিঁড়ি লাগানোও নাকি অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কোনভাবেই সামলানো যাচ্ছিল না অপেক্ষমান হাজার হাজার জনতাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে গোপনে কবিকে নামানো হয় বিমানের পেছনের দরজা দিয়ে। কোলে করে ওঠানো হয় অ্যানুলেঙ্গে। স্বাভাবিক পথে নয়, বিমানবন্দরের উত্তর দিকের ফ্লাইং ক্লাবের পথ দিয়ে কবিকে ধানমন্ডিতে তাঁর জন্য নির্ধারিত বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়। বঙ্গবন্ধু নিজে বাড়িটি পছন্দ করে এর নাম দিয়েছিলেন ‘কবি ভবন’। সরকারের বরাদ্দ করা সেই বাড়িটি এখন নজরুল ইনস্টিটিউট।

নজরুলকে কবি ভবনে নেওয়ার পর সেখানে ফুলেল শুভেচ্ছায় স্বাগত জানাতে ছুটে যান দেশের কাণ্ডারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কবি পরিবারকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেয়ার নির্দেশ দেন তিনি। তাৎক্ষণিকভাবে কবির পেনশন সাড়ে তিনশ টাকা থেকে এক হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়। এক এক করে কবিকে স্বাগত জানাতে আসেন মন্ত্রিসভার সদস্যরা। আসেন মণ্ডলানা ভাসানীসহ বিশিষ্ট জনেরা। হাজার হাজার

মানুষ ফুল হাতে ভিড় জমায় কবি ভবনের আশপাশে। কবি ভবনে প্রতিদিন পূর্ণ রাত্তরীয় মর্যাদায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা শুরু হয়। ত্রিশের দশক বাদ দিয়ে সারাজীবন কবির অর্থকষ্টে কাটলেও ঢাকায় এই প্রথম কবির জীবনে অর্থাভাব দূর হয়। শুরু হয় আপাত সুখের পর্ব। চিকিৎসাসহ সেবা-শুশ্রূষায় কবির স্বাস্থ্য কিছুটা উন্নতির দিকে যেতে থাকে। কিন্তু হলে কি হবে। বয়স বাড়ছিল। এভাবে সময় যায়। সময় গড়িয়ে যায়। পরবর্তী বছরের জন্মদিন আসে। ভারত থেকে কবিকে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি জোরদার হয় না। তাগাদাও আসে না।

তবে নজরুলকে নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের উচ্ছ্বাস কিন্তু চলতেই থাকে। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭৫ সালের ২২ জুলাই কবিকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাখা হয় ১১৭ নম্বর কেবিনে। ১৯৭৬ সালে কবিকে একুশে পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিক না হলে পদক দেওয়া যায় না বলে ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে নাগরিকত্বও দেওয়া হয়। এ সময় তিনি পিজি হাসপাতালে ভর্তি। অবশেষে ৭৭ বছর বয়সে ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট সকাল ১০ টা ১০ মিনিটে চিকিৎসাধীন কবি পিজি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গানের বুলবুলি চিরমুজি পেলেন অনন্ত আকাশে।

৩.

কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন কবির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকলে তিনি ঢাকায় আসতেন কি না। এ প্রশ্ন অবাস্তব কেননা কবিকে আনা হয়েছিল সাময়িকভাবে। জন্মদিন পালনের জন্য। অবশ্যই আসতেন। কারণ বাংলাদেশের প্রতি তাঁর আলাদা টান ছিল। তিনি নিমন্ত্রণ পেতে পছন্দ করতেন। বয়সকালে কবি কলকাতা থেকে কুড়িগ্রাম এসেছিলেন স্কুলের একটি মিলাদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে। ঢাকায় আসাসহ স্থায়ী হওয়ার ব্যাপারে বিবিসি বাংলাকে কবি পরিবারের সদস্য সঙ্গীতশিল্পী সোনালি কাজী বলেছেন, কবিকে ঢাকায় পাঠাতে তাঁর পরিবার রাজি হয়েছিল প্রধানত উন্নত চিকিৎসার আকর্ষণে। “তিরিশ বছর ধরে একটা মানুষ নির্বাক, তাঁর মস্তিষ্ক কাজ করছে না। কলকাতার ডাক্তাররাও এক রকম জবাব দিয়ে দিয়েছেন। এই অবস্থায় একটি নতুন দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তাঁরা যথাযোগ্য মর্যাদায় কবিকে নিয়ে যাবেন এবং ভাল করে চিকিৎসা করাবেন। তখন কবির পরিবার যদি তাঁর কথায় আস্থা রাখে, তাহলে কি তাদের দোষ দেওয়া যায়?” ভিন্ন মতের ওরা বলে, ঢাকার লোকেরাই তো তখনকার দিনে চিকিৎসার জন্য কলকাতা যেত। ঠিক আছে, যেত। কিন্তু কারা যেত? কলকাতায় ততদিনে নজরুল যে একজন অর্ডিনারি পাবলিক! প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে রাত্তরীয় আমন্ত্রণে সংবর্ধনা দেবার জন্য ঢাকায় আনা হচ্ছে। কাজেই কলকাতার চেয়ে ঢাকায় চিকিৎসাসহ যত্নাদি যে বেশি হবে তা কি বলার অপেক্ষা রাখে?

বাহাত্তর সালে কাজী নজরুল ইসলামের দেশান্তরকে দেশান্তর বলা যায়? বাংলাদেশও কি তার দেশ নয়? ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হাবিবুল্লাহ বাহার নজরুলকে সাহিত্য বৃত্তি দেওয়ার প্রস্তাব করলে তা গৃহীত হয় এবং কবি পরিবারকে মাসে ২০০ টাকা করে দেওয়া শুরু হয়। দেশ বিভাগের পর দেখা যায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার উত্তরসূরি ভারত সরকার ছাড়াও পূর্ববঙ্গ সরকার। পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান সরকার কবিকে মাসিক বৃত্তি দিতে সম্মত হয়। যদিও বৃত্তির অর্থ পেতে পেতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। দেওয়া শুরু হয় ১৫০ টাকা করে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পাকিস্তান সরকার এ ভাতা দেওয়া বন্ধ করে দিলে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার মাসে ৩৫০ টাকা করে ভাতা দিতে শুরু করে। কোলকাতায় প্রবাসী সরকারের কূটনৈতিক জনাব হোসেন আলী কবি পরিবারকে সরকারের পক্ষে নগদ অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। সে হিসেবে বলা যায়, সাহিত্যিকের দেশান্তর বলতে যা বোঝায় নজরুলের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। বাংলাদেশ নজরুলের প্রিয় জায়গা ছিল। কবিকে ভারত যা দিতে পারেনি বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি দিয়েছে। কবির নামে এদেশে বহু স্কুল-কলেজ, ছাত্রাবাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল, মিলনায়তন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। সর্বশেষ ময়মনসিংহের ত্রিশালে ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারতের নজরুল অ্যাকাডেমির সভাপতি কবি জয় গোস্বামীর ভাষায়, নজরুলকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রভূত সম্মান দিয়ে, বিরাট মর্যাদা দিয়ে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান এমন এক সময়ে যখন তাঁর “মেমোরি অব ওয়ার্ডস” নেই, শব্দরা তাঁর স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে, একটা লাইনও তিনি লিখতে পারেন না - তারপরও তাঁকে আপ্যায়নে, সম্মানে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের মানুষেরা।.... আর এখানেই নজরুলের অনন্যতা”। গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশে যে নজরুল চর্চা পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও অনেক বড় ক্যানভাসে হয়েছে, সে কথাও নির্দিধায় মানেন তিনি। #

তথ্যসূত্র: গোলাম মুরশিদের *বিদ্রোহী রণক্লান্ত: নজরুল জীবনী*, আবুল ফজলের *রেখাচিত্র* এবং বিবিসি বাংলাসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা।

লেখক: সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার (প্রেস অ্যান্ড মিনিস্ট্রিয়াল পাবলিসিটি), তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।